দৈনিক ইনকিলাব

41

তারিখ ... MAR 06 2000
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 8

অভিমত

পরীক্ষায় নকল রোধের উপায়

চৌধুরী আবদুল হান্নান

গত ১১ই ডিসেম্বর দৈনিক 'সংবাদ'-এ 'নকলের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টির বিকল্প নেই' শিরোনামে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোই পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে স্থান পায়। সে বিবেচনায় দেশের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নকল প্রবণতার ভয়াবহতা ও তার প্রতিকার বিষয়ে 'সংবাদ' তার নিজস্ব ভাবনার কথা এবং নকল প্রতিরোধ করার উপায় সম্পর্কে বলেছে।

সামাজিক প্রতিরোধ বা সচেতনতা সৃষ্টি হবে কিভাবে? সমাজের কোন সচেতন সংগঠন, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গ নকল করে পাস করার কুফল সম্পর্কে কি অবিরাম প্রচার চালাচ্ছে? রেডিও, টেলিভিশনসহ সব প্রচার মাধ্যমে এর সুদূরপ্রসারি জাতীয় ভয়াবহতা নিয়ে কি তেমন প্রচার আছে? তা হলে সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি হবে কিভাবে? এ ঘাতক ব্যাধি নির্মূল করার কাজটিতো আমরা আজও শুরুই করিনি। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার সকল শিক্ষার্থীই তো নকল করে পাস করার এক ভয়াবহ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। শিক্ষক অভিভাবকগণ তার ছাত্র, পুত্র কন্যাকে নকল সরবরাহ করছে। নকল যারা প্রতিরোধ করবে তারাই তো সরবরাহ করছে। নকল করলে শাসিত এটা নিশ্চিত করতে না পারলে নকল বন্ধ হবে কিভাবে?

সামাজিক প্রতিরোধ বা গণসচেতনতা বা গণআন্দোলন একদিনে সৃষ্টি হয় না। সে জন্য প্রয়োজন একদশক, দুদশক বা শতবর্ষ। '৪৭-দেশ বিভাগের পরই বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্য গণসচেতনতার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী সাংস্কৃতিক কর্মী এবং সমাজের সচেতন নাগরিকগণ নানাভাবে গণসচেতনতা বৃদ্ধির পক্ষে কাজ করতে আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে অধিকার আদায়ের সচেতনতা সামাজিক প্রতিরোধ এবং গণআন্দোলনে রূপ লাভ করে। যার পূর্ণতা লাভ করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্মের মাধ্যমে। অন্যদিকে ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে লর্ড ক্লাইভের বাহিনীর সাথে যখন সিরাজদ্দৌলার বাহিনীর যুদ্ধ চলছে; তখন যুদ্ধ ক্ষেত্রের পাঁচশত গজের মধ্যে কৃষকগণ গরু দিয়ে হালচাষ করছিল। যুদ্ধের দিকে তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। কারণ রাজায় রাজায় যুদ্ধ--আমাদের কি? আমি কেবল সে সময়কার গণ-সচেতনতার স্তরের কথা বুঝাতে চাইছি।

পরীক্ষায় নকল বন্ধের জন্য আমরা যদি সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টির আশায় বসে থাকি তাহলে আমাদের কি হবে? তত দিনে আমরা ডুবে যাব। বুদ্ধি বৃত্তির চর্চা, জ্ঞান সাধনা, এমনকি শিক্ষা ব্যবস্থা সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ব্যাধি কেবল ব্যক্তিকে গ্রাস করে না, সমাজ ও জাতিকে ধ্বংস করে দেয়।

নকল রোধের বিষয় নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা হলে ভূরি ভূরি আকর্ষণীয় প্রস্তাব পাওয়া যাবে। কেউ কেউ দীর্ঘ পুস্তক ও রচনা করে ফেলতে পারেন কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। অথচ পরীক্ষায় নকল রোধের সহজ উপায় রয়েছে। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আমার একটি লেখা দৈনিক 'সংবাদ'-এর ১-৭-৯৮ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

সুধী ও সচেতন মহল এবং শিক্ষা বিভাগ ও পরীক্ষা প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন।

মূল বিষয়টি হলো পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্নপত্র পরিবর্তন করা। প্রশ্নপত্রে সংখ্যা ও সময় এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে- যে ছাত্র যত বেশি নকলের চেষ্টা করবে সে তত বেশি পিছিয়ে পড়বে। যেমন তিন ঘন্টার পরীক্ষা হলে নব্বইটি প্রশ্ন করা যায়।

তাতে প্রতি দু মিনিটে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। পরীক্ষার্থীদের অতি দ্রুত এগুতে হবে। প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রের মধ্যে মন নিবিষ্ট রাখতে হবে। নড়াচড়া করার মতো বাড়তি সময় থাকবে না। প্রশ্নপত্র এমন হবে যে, যারা সারাবছর পরিশ্রম করে পড়াশুনা করেছে তারাই পরীক্ষায় ভাল করবে, আর যারা পড়াশুনা করেনি তারা খারাপ করবে। যারা প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন তাদের সচেতন থাকতে হবে যে, যারা প্রকৃতই ভাল ছাত্র তাদের পক্ষে বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হয় এবং যারা নকলবাজ তারা কোনক্রমেই পাস নম্বর পেতে না পারে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরীক্ষার্থীকে ফেল করানোই উদ্দেশ্য নয়; লেখাপড়ার প্রবণতা, পরিবেশ ফিরিয়ে আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এমন দুটি পরীক্ষা অবলোকন করার সুযোগ হয়েছিল আমার। একটির প্রশ্ন তৈরি করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ ও অন্যটি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ বিভাগ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে কর্মকর্তা নিয়োগের সে পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় কোনরকম নকলের প্রবণতা ছিল না। সে সুযোগও ছিল না।

যদিও তা ছিল চাকরিতে প্রবেশের পরীক্ষা। অন্যসব পরীক্ষায় যদি নকল প্রবণতা রোধ করা যায় তবে একাডেমিক পরীক্ষায় পারা যাবে না কেন?

উত্তরপত্রেও কৌশল অবলম্বন করা যায়। প্রয়োজন-বোধে কোন কোন প্রশ্নের উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ খালি জায়গা বরাদ্দ রাখা যায়। বরাদ্দকৃত স্থানের মধ্যেই উত্তর লিখে সমাপ্ত করতে হবে। তাতে মূল কথাগুলোই লিখতে হবে, বাড়তি লেখার সুযোগ থাকবে না। কোন লুস শিট সরবরাহ করা হবে না। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর হাতে প্রশ্নপত্র তৈরি করার দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। মেধা যাচাইয়ের জন্য বিদেশে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নেয়া হয়। একটি পদ্ধতি রয়েছে যা 'ওপেন বুক টেস্ট' নামে পরিচিত। এ পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীরা বইপত্রসহ পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারে। এ ক্ষেত্রেও যারা পুরো বই বা সিলেবাসভুক্ত সকল বিষয়ে পড়াশুনা করবে তারাই ফলাফল ভাল করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে এ রকম পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্রে কৌশল অবলম্বনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নকল প্রবণতা রোধ করার উপায়।